Southeast University Journal of Arts and Social Sciences, Vol. 3, Issue 2, December 2020

উপকূলের রহস্যময় জীবনের অন্তঃউপস্থাপনা: *জন্মজাতি* ও *মৈনপাহাড়*

হামিদা বেগম[১]

An Internal Introduction to the Mysterious Coastal Life of the Novels *Janmajati* and *Moinopahar*

Hamida Begum

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে রয়েছে সুবিশাল সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল। এই উপকূল অঞ্চলের ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ সমতল ভূভাগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময়। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তাধারা, জীবন, জীবিকা, মননশীলতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পেশা, ভাষা, লোকজীবন, প্রথা, মিথ, বিশ্বাস ও কিংবদন্তি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যও আলাদা। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক সমুদ্র-উপকূলবর্তী এই জীবনকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম মুহম্মদ নূরুল হুদা (জন্ম: ১৯৪৯)। তাঁর প্রথম দু'টি উপন্যাস যথাক্রমে *জন্মজাতি* (১৯৯৪) ও *মৈনপাহাড়* (১৯৯৫), যেখানে বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের রহস্যময় ও স্বতন্ত্র জীবনযাপন উঠে এসেছে নান্দনিক ব্যঞ্জনায়। উপস্থাপিত হয়েছে জীবনের গভীরতা। এই উপন্যাস দু'টির মধ্য দিয়ে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বহুমাত্রিক উপস্থাপন তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: বাংলা উপন্যাস, উপকূলবর্তী জীবন, মুহম্মদ নূরুল হুদা, জন্মজাতি, মৈনপাহাড়, নারী চরিত্র, লোকজীবন

Abstract

The southeastern and south-western parts of Bangladesh are enclosed by the vast coastal areas of the Bay of Bengal. The geographical and natural environment of this coastal region is relatively distinct and varied compared to the flat terrain. As a result, thought, education, culture, profession, livelihood, language, folk life, customs, myths, beliefs and legends of the people of this region are also different and multifasceted. Poet Mohammed Nurul Huda (B. 1949) is one of the few novelists in Bangladesh who has written novels about this coastal life. Nurul Hudas's first two novels, named *Janmajati* (1994) and *Moinopahar* (1995), respectively, reveal the mysterious and unique way of life of the coastal people of Bangladesh. The depth of life has been introspected collectively and intricately. This essay attempts to illustrate the multidimensional representation of the life of these coastal people through two novels.

Keywords: Bengali novel, coastal life, Muhammed Nurul Huda, Janmajati, Moinopahar, folklife

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে সুবিশাল সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল। এ উপকূল অঞ্চলের ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ সমতল ভূভাগের তুলনায় স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময়। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তাধারা, জীবন, জীবিকা, মননশীলতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পেশা, ভাষা, লোকজীবন, প্রথা, মিথ, বিশ্বাস ও কিংবদন্তি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যও আলাদা। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন

[১] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
E-mail: hbegum06@gmail.com

ঔপন্যাসিক সমুদ্র-উপকূলবর্তী এ জীবনকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন, যা আমাদের সাহিত্য ধারায় সৃষ্টি করেছে একটি স্বতন্ত্রমাত্রা।

এ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক মুহম্মদ নূরুল হুদার (১৯৪৯-) দুটি উপন্যাস *জন্মজাতি* (১৯৯৪)[৩] ও *মৈনপাহাড়* (১৯৯৫)[৪] সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদকে নিয়ে রচিত অন্য সব ক'টি উপন্যাসের চেয়ে একেবারে ভিন্ন ধাঁচের ও বৈচিত্র্যময়।তিনি তাঁর বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে এনেছেন, লবণাক্ত জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা সমুদ্র-সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর বঞ্চিত জনজীবনের চাহিদা, বিশ্বাস, রীতিনীতি, রহস্যময় অভিব্যক্তি, সংস্কার, ধর্ম, পুরাণ ও ইতিহাস। আবার উপকূলের প্রকৃতি মাটি, ফুল, বাতাস, নদীর গড়ন এবং মানুষের পেশা, পেশার সরঞ্জাম, পেশা সংক্রান্ত বিস্তারিত পরিচয়ও রয়েছে তাঁর উপন্যাসদ্বয়ে। অনেক অজ্ঞাত তথ্যও রয়েছে, যা সমুদ্র-উপকূলীয় জনজীবনের এক রহস্যময়তাকে নির্দেশ করে।

ঔপন্যাসিক মুহম্মদ নূরুল হুদা বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের জনপদ, দক্ষিণে লুসাই পাহাড় ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল ও তার কাহিনি এবং কিংবদন্তি নির্ভর এক রহস্যময় লৌকিক জীবনধারাকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসদ্বয়ে। উপকূলবর্তী জীবনধারাকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি তাদের অতীত জীবনের সাথে তাদের বর্তমান সময়ের এক চমৎকার সমন্বয় গড়ে তুলেছেন। ফলে উপকূলের এক অজ্ঞ,অজ, এবং অন্ত্যজ জীবনধারা আমাদের সামনে এক অসাধারণ শিল্প সমৃদ্ধ জীবনধারায় আলোকিত হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের বিষয়ভাবনা ও গঠন কৌশলের অভিনবত্বই উপকূলীয় অঞ্চলকে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অনেক বেশি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান করে তুলেছে এখানে।

জন্মজাতি উপন্যাসে দেখা যায়, ঔপন্যাসিক একজন কথকের ভূমিকায় (উপন্যাসে 'অনু' চরিত্র) ফুলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামের প্রকৃতি ও জনজীবনের চিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসটির সূচনায় রয়েছে, জীবনের শুরু ও সমাপ্তির কথা। অর্থাৎ জীবনটা যেন একটি বৃত্তের মতো, যেখান থেকে ইচ্ছে শুরু হয়ে যেখানে ইচ্ছে শেষ হতে পারে এবং শেষ হয়ে আবার শুরু হতে পারে- এ বক্তব্যের অনুরণনের মধ্য দিয়ে কাহিনির সূচনা। জীবন কাহিনির এই ধরনের বিন্যাসময়তা অপর উপন্যাস *মৈনপাহাড়ে*ও খুঁজে পাওয়া যায়। *মৈনপাহাড়* লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস, তবে একে *জন্মজাতির* মূল কাহিনির সম্প্রসারিত রূপ বলা যায়। *জন্মজাতি*তে সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকা, জনজীবন ও নিসর্গচিত্র প্রাধান্য পেলেও *মৈনপাহাড়ে* রয়েছে অপেক্ষাকৃত সমতলের জীবন ও আরাকান রোডের পূর্বপাশের সুবিস্তৃত যে অরণ্যবেষ্টিত লুসাই পর্বতমালা, তারই রহস্যময় অরণ্যজীবন, লোকচরিত্র, লোকবিশ্বাস ও কিংবদন্তির প্রাধান্য। দুটি উপন্যাসই আলাদা করে আলোচনার মধ্য দিয়ে উপকূলের অরক্ষিত, রহস্যময় জনজীবনের সত্যনিষ্ঠরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

জন্মজাতি

ঔপন্যাসিক মুহম্মদ নূরুল হুদার প্রথম উপন্যাস *জন্মজাতি* বাংলাদেশের উপন্যাসে উপকূলীয় জীবনকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশ। আঞ্চলিক জীবনকে তুলে ধরার পাশাপাশি এই উপন্যাসে যেবিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে, তা হল বিশ্লেষণধর্মিতা ও জীবনকে দেখার বিশেষ দার্শনিক ভঙ্গি। ছোট ছোট মোট ত্রিশটি অধ্যায়ে গঠিত *জন্মজাতি* উপন্যাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জনপদ, দক্ষিণে লুসাই পাহাড় ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল ও তার কাহিনি এবং কিংবদন্তি নির্ভর লৌকিক জীবনধারাকে তুলে ধরা হয়েছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, সমকালের সঙ্গে উপকথার, লৌকিক জীবনের সঙ্গে প্রত্নজীবনের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন এক অসাধারণ শিল্পকর্ম *জন্মজাতি*।[৫] ঔপন্যাসিক একজন কথকের ভূমিকায় (অনু চরিত্র) এখানে ফুলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী উপকূল অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের চাহিদা, বিশ্বাস, রীতিনীতি, রহস্যময় অভিব্যক্তি, প্রকৃতি ও মানুষের ব্যবহৃত উপাদানসমূহ- মাটি, বাতাস, পানি, অরণ্য, পাহাড়, মাছ, পাখি, ফুল, নৌকা, জাল প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সূক্ষ্ম বর্ণনার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র জীবনধারাকে উপস্থাপন করেছেন। কখনো চরিত্রের মধ্যদিয়ে কাহিনিকে আবার বিভিন্ন বিচিত্রসব রূপকথা, ধর্মীয় লোককাহিনি, গোঁড়া প্রাচীন ধর্মীয়বিশ্বাস, আচার, কুসংস্কার, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তির বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রের বিন্যাস– এভাবে *জন্মজাতি* উপন্যাসে উপকূলের স্বতন্ত্র এক জীবনধারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের চরিত্ররাও সরল-সাধারণ নিম্নবিত্তের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হলেও তাদের রয়েছে রহস্যময় অভিব্যক্তি।

উপন্যাসের সূচনায় রয়েছে রমণীদাস চরিত্রটির উপস্থিতি। সে ফুলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী গ্রামের লুসাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি। কাহিনির শুরুতে দেখা যায়, সে একটি পেতলের গোলগাল ধাতব পাতে আঘাত কওে স্কুলের ছুটি ঘোষণা করছে। ঔপন্যাসিক তাকে এভাবে পরিচয় করিয়ে দেন:

> বেঁটো খাটো মানুষ রমণীদাস। পেটানো শরীর, তবে হাঁটার সময় একটু খোঁচায়, চুলগুলো কাঁচা পাকা, গায়ের রং আলকাতরার মতো কালো, লোকে বলে হাবসী কালো।[৪]

এ চরিত্রটির মাধ্যমে উপকূলের অতীত ইতিহাসকে বর্তমানের সাথে সমন্বয় করে তুলে ধরা হয়েছে যাপিত জীবনের চিত্র। এখানে রমণীদাসের একটি অতীত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার বর্তমান জীবন ও জীবিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে ছিল আরাকান রোডের বাসিন্দা, এক টগবগে যুবক। যুদ্ধের কারণে আসা হাবশী সৈন্যদের শরীরের আগুন নেভাতে যে 'ঝিকঝিক' সরবরাহ করা হতো সে ছিলো সেই 'ঝিকঝিক'দেরই একজন। মিলিটারি লরীর পিছনে ছুটতে গিয়ে একদিন অন্য লরীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনায়, সে তার পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে। এভাবে বিকলাঙ্গ শরীর ও অক্ষম পুরুষত্ব নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে। সে নিজের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দিয়ে লুসাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা ছাড়া স্কুলের সমস্ত কাজকর্ম সে নিজেই করে।[৫] বছরে বছরে স্কুলের পরিবর্তন হয়, কিন্তু রমণীদাসের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনা। এক বহমান কালের মতো সে উপকূলীয় অঞ্চলের অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে জীবন অতিক্রম করতে থাকে। তবে শারীরিক অক্ষমতা তাকে মানসিকভাবে করে তোলে অনেক বেশি সক্রিয়, খুলে দেয় তার মনোলোক। মৈশখালি পাহাড়, পাহাড় চূড়ার আদিনাথের মন্দির, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, সূর্য, নক্ষত্র, নিবিড় বাঁশঝাড় তাকে পরিণত করে এক প্রকৃতি-মানুষে।[৬] স্বগত প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরের সূত্রে রমণীদাস এই উপন্যাসের এক ব্যতিক্রমী চরিত্র হয়ে ওঠে:

> তাহলে মানুষ কি? নিজেকেই প্রশ্ন করে রমনীদাস। আমি তরু মানুষ, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সব জায়গায় ঘুরে আসার মানুষ।[৭]

স্কুল ঘরের পূর্ব পাশের একটু বাড়ানো চালটার নিচে ছোট্ট চালাঘরে রমণীদাস বাস করে। সে স্কুলের একজন সাধারণ দপ্তরি হলেও উপকূলীয় অঞ্চলের নৈসর্গিক পরিবেশ, পাহাড়-নদী-সমুদ্র আর সংগ্রামী জীবন তার মধ্যে দার্শনিক মনোবৃত্তির জন্ম দেয়। সেই ভোরসকালে ফুলেশ্বরীর নিটোল জলে ডুব দিতে দিতে তার জানতে ইচ্ছে করে –

> নিজের ভেতরকার সেই চকিত অনন্ত লোকের স্রষ্টা কে?
> সেকি নিজে? রমণী দাস জানে না।[৮]

এ রকম আত্মপ্রশ্নে রমণীদাস সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখে:

> : তুমি কি তোমার নিজের জন্ম মুহূর্ত জানো?
> : না জানিনা।
> রমণীদাস হাসে। বিজয়ের হাসি, নিজেকে জয় করার হাসি। তারপর নিজেই বলে,
> : বাহা রমণী বাহা, তুমি তোমার জন্ম মুহূর্ত জানো না। তুমি তোমার মৃত্যু মুহূর্ত জানোনা।
> তুমি কেবল জানো জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী গুটি কয়েক বছরের কথা।[৯]

এ রকম অসামান্য দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক মনোলোকের অধিকারী করে ঔপন্যাসিক রমণীদাস চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন।সাধারণ মানুষের মতো চালাঘরে এসে চুলা জ্বালানো,পান্তা ভাতে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এইসব মানুষের মনোলোকের মধ্যেও যে অসাধারণত্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়, সেটিই দেখানো হয়েছে এই চরিত্রের মাধ্যমে। উপকূলীয় নারীদের মধ্যেও রয়েছে এই ধরনের অস্বাভাাবিকতা। ঔপন্যাসিক এইসব অতি সাধারণ নারীদের জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি তাদের চরিত্রের ভিন্নতাকে , উপকূলীয় রহস্যময় প্রকৃতির সমান্তরালে পর্যবেক্ষণ করেছেন। উপন্যাসে রয়েছে, আশি-একাশি বছরের ফোঁকলা দাঁতের বুড়ি 'খুবসুরত'র জীবনের বর্ণনা। এখানে খুবসুরত বুড়ির অতীত জীবনের বর্ণনায় উঠে আসে বুড়ির পিতা, যৌবনে হারানো স্বামী দুদাকাত, ওলা বিবির আক্রমণে হারানো মেয়ে গুলবদন ও শেষ বয়সে এসেও অর্থ উপার্জনের জন্য রেঙ্গুনে গিয়ে , লাপাত্তা হয়ে যাওয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় কাটানো,এক উপকূলীয় নারীর বেদনার্ত জীবনের বর্ণনা। ফোঁকলা দাঁতের বুড়িও এখানে অতীত ইতিহাস বহনকারী চরিত্র। 'ওলা বিবি'র উল্লেখের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক প্রাচীন মুসলমান সমাজের অন্ধ ধর্মীয়বিশ্বাস, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও পশ্চাৎপদতার চিত্র তুলে ধরেন।প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী 'ওলা বিবি' হচ্ছে একটি অশরীরী আত্মা– কলেরা রোগের বাহক হিসেবে লোকমানসে তার অবস্থান।

উপন্যাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কথক অনুর 'সোনা ফুফু', সবার কাছে যে 'সোনাবিবি' নামে এক রহস্যময় নারীরূপে পরিচিত। সে অন্ত্যজ সমাজের প্রতিবাদী নারী চরিত্রও। প্রথম যৌবনে এক কাবুলিওয়ালার সঙ্গে

সম্পর্ক তৈরি হয়। শেষে কাবুলিওয়ালা তাকে নোংরা ইঙ্গিত করলে, সে কৌশলে তার দাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ধর্মভীরু ঐ অন্ত্যজ সমাজে যে 'সাহসী পাপ' সে করেছিল তার শাস্তিস্বরূপ স্কুলের যুবক মৌলবি আমীর তাকে গ্রাম ছাড়ার ফতোয়া দিয়েও তা কার্যকর করতে পারে না। কারণ মৌলবির সঙ্গেও রূপসী সোনাবিবি অনেকটা জোর করেই সম্পর্ক স্থাপন করে। অবশ্য উপন্যাসের প্রথম থেকে সোনাবিবির মধ্যে এক অতৃপ্ত যৌন কামনার বহিঃপ্রকাশ ও মৌলবির প্রতি তার গভীর অনুরাগ লক্ষ করা যায়:

> সোনাবিবি এই সুযোগটা কাজে লাগায়। যে মৌলবিকে চোখের সাধ মিটিয়ে দেখে। এ সাধ তার অনেক দিনের। ... কতো লেখাপড়া জানা মানুষ তিনি। এমন মানুষ দশ গ্রামে দুটি আছে নাকি?[১০]

এখানে এ চিত্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সোনাবিবিদের মতো সামান্য জানা সাধারণ নিম্নবিত্ত উপকূলীয় নারীরা আমির মৌলবীদের মতো লেখাপড়া জানা পুরুষদের যে কোনো ভাবেই সম্পর্ক জড়িয়ে নিয়ে তাদের মনের সাধ মেটানোর চেষ্টা করে-

> হঠাৎ অস্তগামী সূর্যের আলোকচ্ছটা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। সেই আলোতে মৌলবির বাঁকানো শরীর রামধনুর মতো বর্ণিল হয়। আকাশের রামধনু নেমে আসে ধরার ধুলায়। সেই রামধনুর দিকে লোভাতুর চোখে তাকায় এক মানবী। মানবীর নাম সোনাবিবি।[১১]

উপকূলীয় মানুষের পুরাতন বিশ্বাস-সংস্কার থেকে শুরু করে প্রচলিত বিচিত্র গল্প-কাহিনি: লঙ্কা মানুষ, কেয়ামতের বর্ণনা, ইয়াজুজ-মাজুজ, আশরাফ-আতরাফ-ইউসুফের আখ্যান, খোয়াজ খিজিরের আখ্যান ইত্যাদি বিচিত্র কাহিনি সোনাবিবির গায়কী ঢঙের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উপকূলের বিচিত্র বিশ্বাস, মিথ, উপাখ্যান প্রভৃতির ইতিহাস তুলে ধরেন। এখানে সোনবিবি সাধারণ নিম্নবিত্ত হলেও রহস্যময় নারী চরিত্রে উত্তীর্ণ। 'বরকেতা গাইন' নামে একজন গায়েন চরিত্রও আছে উপন্যাসে। মূলত আমীর মৌলবি ও সোনাবিবি চরিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনের কথাই বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে সংযুক্ত হয় মানুষের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কিত নানান লৌকিক উপাখ্যান, কাহিনি ও কিংবদন্তি। ফলে সাধারণ গ্রামীণ জীবনের চিত্র হয়েও তা রহস্যময়তায় আবৃত থাকে।

উপন্যাসে রয়েছে আরো উল্লেখযোগ্য চরিত্র: আক্তার মাঝি, তার ছেলে কিশোর, মা ফিরুজা বিবি, কিশোরের বন্ধু মনু। এইসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে উঠে আসে অন্ত্যজ সমাজের বহুমুখী চিত্র। উপন্যাসের কাহিনিতে আছে, বাবা আক্তার মাঝি ও তার ছেলে কিশোর নৌকা নিয়ে দূরদুরান্তে যায়, ওরই সমবয়সী মনুকে মা ফিরুজার দেখাশুনার দায়িত্বে রেখে। একরাতে টকটকিয়ার ঘাট থেকে আক্তার মাঝিকে তুলে নেয় বাঘ। বাপকে হারিয়ে উন্মাদ-প্রায় কিশোর বাড়ি ফিরে দেখে তার মা মনুর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত। এই দৃশ্য তাকে বাড়ি-ছাড়া করে। এখানে ফিরুজা-মনুর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক অন্ত্যজ সমাজের যৌন অভ্যাসের একটি বিশেষ ধরনকে তুলে ধরেছেন। এতে কিশোর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে, ক্রোধান্বিত হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা 'মাঝি' বৃত্তি পরিবর্তন করে বেছে নেয় 'জেলে' জীবন। নতুন পেশাকে সহজে রপ্ত করে সে জীবনের কঠিন পথে হাঁটতে শুরু করে এবং সফলও হয়। এর জন্য উপন্যাসে তাকে 'ছোটখাট মাস্তুল'র সাথে তুলনাও করা হয়। এখানে তীব্র জীবনবিমুখ হওয়া সত্ত্বেও বিরূপ প্রকৃতি ও পরিবেশকে, জয় করে নেয়ার মধ্য দিয়ে, কিশোরের নয়, ঔপন্যাসিক যেন মানুষের টিকে থাকার প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

এছাড়াও আছে আরও কিছু চরিত্র। যেমন, রামকানাই জলদাস, যার কাছে কিশোর জেলে জীবনের দীক্ষা নিয়েছে। আছে জুমিরালী গং, যারা দা, কিরিচ আর বন্দুকের জোরে দখল করে 'নুইন্যা ঘোনা' (লবণের মাঠ), যাদের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, লবণ চাষের ইতিহাসও এর চাষপদ্ধতি। এছাড়া ডোম পেশায় নিয়োজিত রামলাল, কালিপদ, সতিশ, রমেশ, হরি, মালু, কালু, কানাই প্রভৃতি বিচিত্র মানুষের কলরবে গ্রামীণ এক অন্ত্যজ সমাজের চিত্রই এখানে প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যায়ভাবে পারিবারিক সম্পত্তি ভোগ দখলের অপচেষ্টার জের হিসেবে আপন রক্ত সম্পর্কের সাথে খুনোখুনির চিত্রও আছে। প্রৌঢ় নবীবলী ও তার মৃত ভাইয়ের পুত্র জব্বর এই ধরনের ঘটনার প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র এখানে। এভাবে *জন্মজাতি* উপন্যাসে ছিন্নভিন্ন চরিত্রগুলো গ্রন্থিত হয়ে অবিচ্ছিন্ন এক উপকূলীয় সত্তায় পরিণত হয়েছে।

আবার প্রায় পুরো উপন্যাস জুড়ে অনু, সূর্য ও পাখি চরিত্র তিনটির আচরণ ভিন্ন তাৎপর্যময়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, কথক অনু স্বপ্ন দেখছে, সে তার বান্ধবী পাখিকে নিয়ে অন্য এক পৃথিবীর দিকে যাত্রা করছে।

তারা আর অবোধ বালক-বালিকা নেই, যুবক-যুবতীতে পরিণত হয়েছে। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, ঔপন্যাসিক, রহস্যময় এক পরাবাস্তব আবহ নির্মাণ করেন এখানে।

জন্মসূত্রে কক্সবাজার এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার ফলে ঔপন্যাসিক মুহম্মদ নূরুল হুদা সমুদ্র, নদী, পাহাড় ও অরণ্য সম্বলিত উপকূলীয় কিংবদন্তি জীবনধারার একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন পাঠকদের। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে এই উপকূলীয় অঞ্চলে। লোকজীবনে প্রোথিত বিশ্বাস, সংস্কার, সংগ্রাম, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রাত্যহিক জীবন, দাম্পত্য ও যৌনজীবন ইত্যাদি জীবনের এই সব অনুসঙ্গ এখানে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত। সহজ সরল অথচ রহস্যময়। বিচিত্র সব চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক উপকূলীয় অঞ্চলের লোকজীবনের গভীরে যুগ পরম্পরায় আচরিত প্রত্ন-বিশ্বাসকে, নৃ-বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁর বয়ানের স্বাদ অগতানুগতিক। আবার কখনো একেবারেই সহজ-সরল লোকমানুষের বুলির মতো। যেমন, *জন্মজাতি* উপন্যাসের একটি অধ্যায়ে (চতুর্থ অধ্যায়ে) আছে সম্পূর্ণ বালির বর্ণনা, যাকে বলা হয়েছে 'বালির সংসার'র বর্ণনা। উপকূলীয় বিভিন্ন জাতের মাছ, পাখি, মাছ ধরার কৌশল, নৌকা ও সরঞ্জামের রয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশদ বিবরণ। উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের পেশা-বৃত্তির খুঁটিনাটি সব বিষয়, তাদের ব্যবহৃত সরঞ্জামের গঠন-কৌশল, ব্যবহার পদ্ধতি–এই সমস্ত কিছুর বিস্তারিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠক একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের আচরিত জীবনেরই স্পর্শ, গন্ধ অনুভব করেন এ উপন্যাসে। উল্লেখ্য, বরকেতা গাইন, এ চরিত্রটির গানের মাধ্যমে উৎকীর্ণ হয়েছে উপকূলীয় বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তি ও ইতিহাসের কথা।

উপকূলীয় জনপদের স্বতন্ত্র জীবনধারার চিত্রায়ণে, ঔপন্যাসিক এখানে যে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, তা ভিন্নমাত্রায় পর্যবসিত। তাঁর বলার ভঙ্গি অকপট, স্বচ্ছ এবং ঋজু। তাঁর বর্ণনা সূক্ষ্ম ও অনুপুঙ্খ। যেমন, ফোকলা দাঁতের খুবসুরত বুড়ির মুখের বর্ণনা দেন এভাবে:

> সেই ফোকলা গালে বুড়ি সারাক্ষণ পান চিবোয়। গালের দুপাশে দুটি গর্ত ওঠে আর নামে। গর্ত তো নয়, যেন পাক খাওয়া আবর্ত। আষাঢ়ে শ্রাবণে নদীর ভরন্ত জলে যেমন ছোট ছোট ঘূর্ণি ঢেউ, তেমন দুটি ঘূর্ণি। ঘরের দাওয়ায় বুড়ি বসে পা ছড়িয়ে। একটু পর পর চীৎকার দেয়, 'মর দামড়ি মর, মর দামড়া মর।'[৯]

উপন্যাসের ভাষা গীতল ও কাব্যধর্মী। ছোট ছোট সরল বাক্য, পরিচিত ও পেশামূলক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। গদ্যকবিতার ভাব ও ছন্দের স্বাদ রয়েছে ভাষায়। যেমন,

> কথা বলে।
> অজস্র কথা।
> সে কথা প্রলাপের মতো।
> একটানা আর প্রলম্বিত।
> আপাত-অর্থহীন, তবু অর্থময়।
> এক কথার অনেক দ্যোতনা,
> অনেক ব্যঞ্জনা।
> সেকি বলতে চায়:
> 'একটি মুহূর্ত হোক অনন্তের জন্মোৎসব
> আমাদের নিয়তি, বিবাহ?'[১০]

এছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পদ ও বিচিত্র শব্দের প্রয়োগ, বর্ণনার ধরণ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল ও তার স্বতন্ত্র জীবনাচরণের প্রকাশ উপন্যাসটিকে বিশিষ্টতা দান করে। বিশেষ করে, এই উপন্যাসে উপকূলীয় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তা উল্লেখ করা হলো:

ক. উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পদ:

> খাইয়্যম দাইয়্যম জাল ফেলাইয়্যম
> ধইজ্জম চিরিং মাছ
> গিরিং চালর ভাত খাইয়ারে

কাইট্টম বনর গাছ।
বনত আছে রসাল বৃক্ষি
দইজ্জাত আছে মাছ
পারাই যাইয়্যম মৈনর পাহাড়
ন ফিরিয়্যম পাছ।[১৪]

খ. আঞ্চলিক ভাষায় বিচিত্র সব পাখির নাম: ধলি বগা, কানা বগা, চেগা, ভাঁদি হাস, টেইয়া, ডেইয়া, হট্টিটি, গাংটেইয়া, হাড়গিলা, কাউয়া।

গ. প্রশ্ন-উত্তর, প্রতি-প্রশ্ন, প্রতি-উত্তর:

কেমন যেন এক ভাললাগা অনুভূতি। কেমন যেন গলে যাওয়া অনুভূতি।
গলে যাওয়া?
হ্যাঁ গলে যাওয়া।
নারকেল তেলের মতো গলে যাওয়া।
কেমন নারকেল?
ঝুনা নারকেল।
কেমন ঝুনা?
সবার জানা।
কেমন সবার?
বলতে মানা।[১৫]

ঙ. চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপভাষিক শব্দের প্রয়োগ:

চট্টগ্রামি শব্দ	প্রমিত বাংলা
কৈতর	কবুতর
কুম	গভীর
খাইয়ম	খাব
ডিয়া	উঁচু ঢিবি
রোয়া	রোপণ করা
দইজ্জা	দরিয়া
ধুঁইপিঠা	ভাপাপিঠা
মুরা	জঙ্গল

উপন্যাসটির শুরুতে পবিত্র 'বাইবেল'র বাণীর উল্লেখ আছে। এটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে। উদ্ধৃতাংশে মানবজাতির সৃষ্টি সংক্রান্ত যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা এখনো লোকমানসে বিশ্বাসরূপে বিরাজমান। আর *জন্মজাতি* নামকরণের মধ্যে রয়েছে মানবসৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের ইঙ্গিত।'[১৬]

জন্মজাতি উপন্যাসে উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার জনজীবন, তাদের লোকায়ত জীবনের বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্ম, পুরাণ, কিংবদন্তির সঙ্গে নিম্নবিত্ত সমাজের সামাজিক রীতিনীতি, বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও বিশ্বাসের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। উপকূলের জনজীবনে যে আদিম রহস্যময়তা, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে যে ভিন্নতা তা মানুষের জীবনযাত্রা, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে এক স্বাতন্ত্র্যবোধ তৈরি করে। এ উপন্যাসে রয়েছে তারই সুনিপুণ চিত্রায়ণ।

মৈনপাহাড়

মৈনপাহাড় ঔপন্যাসিক মুহম্মদ নূরুল হুদার দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস *জন্মজাতি*র সমগোত্রীয়। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন *জন্মজাতি*র পটভূমি অবলম্বন করে তিনি এই উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসেরও উপজীব্য দক্ষিণ লুসাই পাহাড় ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল, এর জনপদ, পুরাণ ও কিংবদন্তি-নির্ভর লৌকিক জীবন। গ্রন্থের প্রচ্ছদে মুদ্রিত পরিচিতি-পত্রে বলা হয়েছে:

> বিশাল ব্যাপ্তি ও গভীর জীবনোপলব্ধি নিয়ে রচিত *মৈনপাহাড়* সমকালীন আঞ্চলিক উপন্যাস সাহিত্যে এক ভিন্নধর্মী প্রচল ভাঙার প্রচেষ্টা। কাহিনীর কতিপয় চরিত্রের ভেতর দিয়ে গোটা এক জনগোষ্ঠী তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, কিংবদন্তি, লোকাচার নিয়ে কিভাবে কলরবমুখর হয়ে উঠতে পারে, সমকালকে অবলম্বন করে কেমন করে পৌঁছে যেতে পারে চিরকালীনতার প্রান্তে তারই পরিচয় আমরা পাই।[১৭]

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা মেলে সমুদ্র উপকূলে ব্যবহৃত নৌকার 'মাস্তুলের'। উপন্যাসের ভাষায়:

> আরো দূরে বোঝা যায় বাঁকখালি নদী, নদীতো নয়, পাহাড়িয়া জলকন্যা। পুবের পাহাড় থেকে লাফাতে লাফাতে নামে ঐ পাহাড়িয়া জলকন্যা। ঘোনা মুরা পার হয়ে ঝোপঝাড় পার হয়ে সমতলের বুক চিরে শেষমেশ মিশে যায় বেমানান দরিয়ায়। বাঁকখালি নদী, মৈশখালি প্রণালী আর বঙ্গোপসাগর যেখানে মিলেছে এই তিন তরঙ্গ সেই জলমোহনায় দেখা যায় ওই মাস্তুল।[১৮]

মাস্তুলটি এখানে কোনো এক বহাদ্দার জলযানের প্রতীক। 'বহাদ্দার' হচ্ছে এখানে জেলে বোটের বহর। অবস্থাপন্ন জেলেরাই এই বহরের মালিক। এদের থাকে মাছ ধরার অনেক নৌকা আর তাতে অমানুষিক পরিশ্রম করার অসংখ্য জেলে। বহাদ্দারের বহরের সীমানা গভীরতর সমুদ্রে। মাছ ধরে ওরা লাল বওটা বা পতাকা বা নিশান খাটায়। তারপর তারা ফিরে আসে এ অঞ্চলের বিখ্যাত 'কস্তুরি ঘাট' বা 'বদইজ্জার ঘাটে'। উপন্যাসে রয়েছে কস্তুরি ঘাটের কর্মতৎপর জেলেদের ফুসরৎহীন সময়ের অনাড়ম্বর চিত্র। তাদের মাছ ভাগ বাটোয়ারা, বিভিন্ন অঞ্চলে চালান পাঠানো ও মাছ সংরক্ষণের রয়েছে আঁশটে গন্ধময় বর্ণনা। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা 'মাছ মারা'দের জীবনচিত্র তাই এখানে আঁশটে গন্ধে ভারী ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এভাবে উপন্যাসে মূল ঘটনার পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য পেশার মানুষের জীবনচিত্রেরও রূপায়ণ ঘটেছে।

ঔপন্যাসিক মুহম্মদ নূরুল হুদার পূর্ববর্তী উপন্যাস *জন্মজাতি*র 'কিশোর' চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের মূল কাহিনি নির্মিত হয়েছে। *জন্মজাতি* উপন্যাসে যে কিশোর মায়ের উপর ক্রোধ ও অভিমানে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, তাকে *মৈনপাহাড়* উপন্যাসে দেখা যায় মা ফিরোজা বেগমের কাছে ফিরে আসতে। মা ও ছেলের পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে সাগরের ঢেউ এর মতোই উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে যেতে থাকে নানা রহস্যময় লোকাচার, কাহিনি ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে। কিশোর তার জালে ধরা পড়া বিশাল কোরাল মাছ নিয়ে দীর্ঘদিন পর মায়ের সামনে উপস্থিত হয়। দীর্ঘদিনের রুদ্ধতার পর মা-ছেলের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। এই মিলনের মধ্যেও দেখা যায় নানা লোকাচার। কিশোরের আগমনে মায়ের উচ্ছ্বাসে, বিলাপের আহাজারিতে বিচিত্র ভঙ্গি, গ্রামবাসীদের সমবেত হওয়া, গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমীর মৌলবির যোগ দেয়া, কিশোরের মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া, মা ছেলের পুনর্মিলনে আমীর মৌলবি আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে দুই হাত তুলে মোনাজাত করা, 'খোয়াজ খিজিরের' নামে মানত করা মাছটি কেটে টুকরো করে সবার মাঝে ভাগ করে দেয়া ইত্যাদি উপকূলীয় নানা লোকঅভ্যাসের চিত্র উঠে এসেছে।

দীর্ঘদিন পর কিশোরের আগমনে সোনাবিবিও আসে তাকে দেখতে। তার মায়ের সাথে নানা কথার মাঝখানে তার বিয়ের প্রসঙ্গও সে আলাপ করে। তারপর সোনাবিবি চলে যায়। রাতে কিশোর বের হয় সোনাবিবির বাড়ি গোলপাড়ার উদ্দেশ্যে। আর পথেই ঘটে অনিবার্য ঘটনা। গ্রামের একজন অসহায় বিধবা নারীর একমাত্র সম্বল একটি গাভী, সেটি চুরি যাওয়ার সাধারণ ঘটনাকে ঔপন্যাসিক উপকূলীয় রহস্যাবৃত যাপিত জীবনের সাথে সংযুক্ত করে দেন। রহস্যময় বর্ণনায় সেই কাহিনিতে উন্মুক্ত হয় উপকূলীয় অঞ্চলের নানা কুঅভ্যাস, প্রতারণা, বর্বরতা, মীথ ও লোক কাহিনি।

উপন্যাসে আছে,রাতের দ্বিপ্রহরে নির্জন মাঠ দিয়ে যখন কিশোর যাচ্ছিল, দেখতে পায় দু'টি লোক একটি গরু নিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে লোক দু'টোর অস্বাভাবিক চলাচল ও নীরবতায় তার সন্দেহ হয়। খুব দ্রুত লোক দুটির কাছে এসে দেখতে পায় তারা চাদর দিয়ে ঢাকা, কপালে উল্কি আঁকা, মাথায় এক ধরনের গোলটুপি– অদ্ভুত বেশ ধারণ করা। তারা দুজনেই চাদরের নিচ থেকে বের করে একজোড়া কিরিচ এবং কিশোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নাকে এক ধরনের চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে লম্বাটে ধরনের লোকটি প্রচণ্ড আঘাতে তাকে আহত করে এবং সে চেতনা হারিয়ে ফেলে। শেষরাতের দিকে চেতনা ফিরলে তার মনে পড়ে বাঁশী পাগলার খুনের কথা। সহজ সরল বাঁশি পাগলাকে কারা যেন রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে মাঠের মধ্যে

ফেলে রেখেছিলো। বাঁশি পাগলার খুন হওয়ার সঙ্গে এ রাতের ঘটনার কোথায় যেন মিল খুঁজে পায় সে। অবশেষে শেষরাতে সে সোনাবিবির বাড়িতে পৌঁছালে এখানেও এক রহস্যময়তার গন্ধ পায়। সে দেখতে পায়, শেষরাত অবধি সোনাবিবির জেগে থাকা, গোপনে কেউ সোনাবিবির ঘর হতে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, ঘরে ভেতর আলো জ্বলতে থাকা। সে বুঝতে পারে সোনাবিবি একা নয়। অন্য কারো যেন উপস্থিতি আছে ঘরে। কিশোরের ডাকে সোনাবিবি বাতি নিভিয়ে দিলে চুপি চুপি কাউকে বেরিয়ে যেতে দেখে, সে নিশ্চিত হয় তার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। তারপর সোনাবিবি কিশোরকে ডেকে এনে মাদুর পেতে বসতে দিয়ে চুলে হাত বুলিয়ে নির্জন মাঠে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা রহস্যময় ইঙ্গিতে বলে যায়। কিশোর বুঝতে পারে সোনাবিবির ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া লোকটির সাথে তাকে মাঠে হামলাকারী লম্বা লোকটার অনেক মিল আছে। সকালবেলা কিশোর গ্রামটা ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে বের হয়। নাপিত পাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় সে শুনতে পায় নিঃসঙ্গ বিধবা মালিনীর বিলাপ। তার একমাত্র সম্বল গাভীটি রাতে চুরি হয়েছে। সে গরুচোরদের চিনতে পেরেছে। সে যায় আরশি ফকিন্নির কাছে, পরামর্শের জন্য। এখানে আরশি ফকিন্নি হচ্ছে সে রকম একটি চরিত্র যে মানুষকে ঠকিয়ে, মিথ্যা বুজুর্গির মাধ্যমে ভূত-ভবিষ্যত নির্ধারন করে দেয়াকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করে। যদিও আরশি ফকিন্নি কিশোরকে গরুর কোনো খোঁজ দিতে পারেনা। তবে সে আয়না পড়া, তেলপড়া, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি বিচিত্র রহস্যময় ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় মৈনপাহাড়ের কিংবদন্তি তাকে শুনিয়ে সেখানে তাকে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু মৈনপাহাড়ের আকর্ষণে ও গরু চুরির রহস্য উদঘাটনে সে মৈন পাহাড়ের দিকে গমন করে। যেখানে গিয়ে কিশোর যবেদালি ও মালিনীর দেবরপুত্র শংকরকে দেখতে পায়। এদেরকে সে গরু চোর হিসেবে সনাক্ত করে। কিন্তু গরুর খোঁজ সে পায় না। অবশেষে সে পৌঁছে যায় মৈনপাহাড়ের নিষিদ্ধ চূড়ায়। সেখানে এক রহস্যময় পরিবেশে, মৈনপাহাড়ের অসীম নিঃসঙ্গতায় বিভ্রান্ত কিশোরের মনে হয় – 'নড়েনা। চলেনা। যেন সীমাহীন স্থলসমুদ্রে আটকে যাওয়া এক বিশাল জাহাজ।'[১৯] কিশোর নিজের অজান্তেই বলতে থাকে:

> আগে পুরুষ, পিছে পুরুষ,
> মধ্যিখানে নারী
> এই জীবনে পাইলাম শেষে
> মৈন কুমারীর বাড়ি।[২০]

অবশেষে যবেদালির ছুরির আঘাতে প্রাণ হারায় কিশোর। তার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে। মাত্র একদিন ও দুই রাতের কাহিনি এটি। এ স্বল্প সময়ের ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে আনেন মৈনপাহাড় অর্থাৎ লুসাই পাহাড় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের লোকায়ত জীবনের ইতিহাস, সংস্কৃতি, গ্রামীণ লোক পুরাণ, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, প্রতারণা ও রহস্যময় অন্ত্যজ সমাজের বিচিত্র ঘটনা ও বিষয়কে।

কিশোর চরিত্রটি এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। বাবা আক্তার মাঝির মৃত্যু এবং পরবর্তী কালে মা ফিরুজা বিবির অসঙ্গত সম্পর্ক প্রভৃতি তার মনোজগতে সৃষ্টি করে স্থায়ী ক্ষতের। পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে জেলেজীবন বেছে নেয়। এর পেছনে লুকিয়ে থাকে তার তীব্র ক্রোধ এবং ঘৃণা। এই বিচ্ছিন্নতা তার মাঝে জন্ম দেয়, এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার। আর এই নিঃসঙ্গতা তার মধ্যে তৈরি করে এক ধরনের যৌন বিকৃতি। ক্রমে সমকামী মনোভাব তার মধ্যে তীব্রতর হয়ে ওঠে। এ সমকামিতা উপকূলীয় জনপদের জীবনবাস্তবতার একটি আদিম উপাদান। এছাড়া লবণ চাষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, কোরাল মাছ ধরার কৃতিত্ব, সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস ও পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিক জিঘাংসা ও খুন খারাবির প্রতি তীব্র ঘৃণা, জাহাজ ডুবির জন্য সহানুভূতি প্রভৃতি ঘটনা কিশোরকে মানসিকভাবে সামাজিক দায়বদ্ধ মানুষে পরিণত করে।'[২১] সম্পূর্ণ উপন্যাসটি কিশোর-কে কেন্দ্র করে আর্বতিত। এই কিশোরের দৃষ্টি দিয়ে ঔপন্যাসিক দৃশ্যায়ণ করেছেন উপকূলের প্রত্যন্ত জনপদের সংস্কৃতি, কীর্তি, অপকীর্তি, ধর্ম, প্রবাদ-প্রবচন, আহাজারি, বিলাপ ইত্যাদি। উপন্যাসে চিত্রিত প্রত্যন্ত উপকূলীয় গ্রামীণ সমাজে দেখা যায় সম্পর্ক নিয়ে তেমন কোন বাছবিচার নেই। অশ্লীল ঠাট্টা-তামাশা সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত। যেমন, এ উপন্যাসে কিশোর ও তার মা ফিরুজা বিবির মিলনকে সোনাবিবি, আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর মিলনের কাহিনির সঙ্গে তুলনা করে। নৌকা নিয়ে কিশোরের ঘাটে ঘাটে চলার পথে ধরা পড়ে বিচিত্র সব ছবি। থাইল্লা ঘোনায় দুটো মোষের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে কয়েকশ লোক আনন্দে, হৈ হল্লা করে উপভোগ করে যেন আসন্ন ভোজের উৎসব। পৈশাচিক এ লড়াইয়ে মানুষগুলো উপভোগ করে পশুদের ক্ষত-বিক্ষত হওয়া:

> হৈ হৈ করতে করতে মানুষগুলো এদিকেই ছুটে আসছে। অর্থাৎ পরাজিত মোষটা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর রোষ থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে ছুট লাগিয়েছে। পশু ছুটছে পশুর পিছে। মানুষ ছুটছে পশুর পিছে। দু'জনেই মত্ত। দুজনেই উন্মত্ত। পশু ও মানুষ বিনা কারণেই যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।[২২]

দূর জঙ্গলে গৃহপালিত পশুদের ঘাসপাতা খাওয়াতে নিয়ে পশুর সঙ্গে কামনায় মানুষের উন্মত্ত হয়ে ওঠার চিত্রও রয়েছে উপন্যাসে:

> জলের ধারে দুটো প্রাণী। একটা মানুষ ও একটা ছাগল। বেঁটো খাটো দড়ি দিয়ে ছাগলটা বাঁধা। ওটা একটানা ব্যাঁ ব্যাঁ করে যাচ্ছে। ... খুব ঠাহর করে তাকালে বোঝা যায় জোয়ান মরদ লুঙ্গি তুলে সেই ছাগলটার উপর চড়ে বসেছে। যেমন করে জলে ভাসমান মোষের উপর বসে থাকে মোষের রাখাল।[২৩]

উপন্যাসে স্থান পেয়েছে গ্রাম্য প্রবাদ, আহাজারি, বিলাপ, গান, প্রবচন। উপন্যাস হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ফিরুজা বিবির বিলাপ:

> অ মাঝি, মাঝিরে তুঁই কই গেলারে
> তুই ক্যাঁমতে বাঘর পেড়ত গেলারে
> আঁর কপাল ক্যামতে খাইলারে[২৪]

উপন্যাসে রয়েছে, ফিরুজা বিবি কিশোরের ধরে আনা বড় কোরাল মাছটাকে একবার নিজের মতো পরখ করে নেয়। তারপর অন্ত্যজ নারীর মতোই, শরীরের কাপড় ছুঁড়ে ফেলে বিলাপ করে কান্না জুড়ে দেয়। গ্রামের নর-নারীদের বিলাপের ধরন ও আহাজারি এই চিত্রে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আরো আছে কিংবদন্তি বাঁশিওয়ালার পদ:

> বাঁশি আমার পাগলা বাঁশি
> শরীর বাঁশি, পাতলা বাঁশি
> এই বাঁশিতে ডুবি ভাসি
> বাঁশি আমার মন উদাসী।[২৫]

ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের চরিত্রের সাথে মিল রেখে কিংবা কাহিনির দাবি অনুযায়ী এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যে চমৎকৃত হতে হয়।[২৬] যেমন-

> বেশ মনে আছে কিশোরের। যেন এই সেদিনের কথা। সেবার ওরা যখন দ্বীপে এসে পৌঁছায়। তখন রাত নিঝুম। চারিদিকে সুনসান। দাঁড়ের আঘাতে দরিয়ায় জল নড়ে, ঝিলিক মারে ঢেউ চূড়া, আর সব আন্ধার আর আন্ধার। মাথার উপরে অবশ্য কুপি। আকাশের নীল জলে বয়ার মতোন ভেসে বেড়ায় কোটি কোটি নক্ষত্রের কুপি। ভাসে, লাফায়, দাপায়। তবে ডোবে না। নেভে না। নক্ষত্রের কুপি কোনদিন নিভে যায় না।[২৭]

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশ বর্ণনায় লেখক যে পরিবেশ এবং যাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের প্রাত্যহিক চিন্তার উপাদান থেকেই উপমা সংগ্রহ করেছেন। এখানে কোন বাহুল্য নেই, অতি কথন নেই, অতি বর্ণনা নেই।[২৮] উপকূলীয় লবণাক্ত জলের মতো উপন্যাসের ভাষায়ও রয়েছে লোনা স্বাদ।

কিশোর ছাড়াও এই উপন্যাসে রয়েছে আরো বিচিত্রসব চরিত্র: ছলু, থম্বু (মগ পল্লীর মেয়ে), গৌরাঙ্গ জলদাস, জমিদার ঠাণ্ডু চৌধুরী, মানু মিয়া সিকদার, মৌলবী সাহেব, যবেদালি, শংকর, আরশি ফকিন্নি- এরা এখানে উপকূলের নিম্নবিত্ত বিচিত্র জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে।

মৈনপাহাড়ে বিভিন্ন পেশা-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের আচার-সংস্কারের চিত্রের মাধ্যমে সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চলের প্রান্তিক এক জীবনধারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। উপকূলের বিভিন্ন পেশাজীবী জেলে, মাঝি, নাপিত, ডোম, মালোরা ছাড়াও আছে কাছিম ও কাঁকড়া সংগ্রহ করে জীবন ধারণের চিত্র। সমুদ্র উপকূলের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনের

আলেখ্যে এখানে তুলে ধরা হয় বিভিন্ন জাত ও আকারের সামুদ্রিক মাছের পরিচয়: ইলিশ, কোরাল, খুইজ্জা, রূপচান্দা, ভুইল্লা, দাতিনা, কৈন, বাঁ আলা, কই পুঁটি, পুঁয়া, ভ্যাঁদা, বিছাতারা, খরুল, গুইল্লা, বাটা ইত্যাদি ।

নানান অদ্ভুত ঘটনা, মনোভঙ্গি কিংবা দৃশ্যের বর্ণনায় এই উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক *জন্মজাতি* উপন্যাসের মতো প্রশ্ন, উত্তর, প্রতি-উত্তরের আশ্রয় নিয়েছেন। গদ্য ও পদ্যভঙ্গির মিশেলে এক রহস্যময় বিশেষ ভাষাভঙ্গির নির্মাণ দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে। এছাড়া বিষয়, গঠন-কৌশল, সমাজচিত্র, চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-প্রবাহ সব মিলিয়ে সমুদ্র উকূলবর্তী অঞ্চল ও তৎসংশ্লিষ্ট পাহাড়ি জনপদের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে উপকূলবর্তী অঞ্চলের জনজীবনের এক রহস্যময় অভিব্যক্তির সার্থক শিল্পরূপ নির্মিত হয়েছে। মূলত ভিন্ন স্বাদে, মেজাজেও বয়ানে ভিন্ন এক জীবনযাত্রার, ভিন্ন যাপন প্রণালী,উত্তর আধুনিক মেজাজে উপস্থাপনের ঢঙ- এ সবই *জন্মজাতি* ও *মৈনপাহাড়* উপন্যাস দুটিকে বাংলা কথাসাহিত্যে ভিন্নমাত্রার ভাবনার বিষয় করে তুলেছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় উপন্যাস দুটিতে সমুদ্র-উপকূলের সংগ্রামরত মানুষের যে সাধারণ একটা লোকায়ত জীবন তা মিথ, পুরাণ ও কিংবদন্তির কারণে শিল্পগুণে গুণান্বিত ও বহুরৈখিক মাত্রিকতায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। মানুষও প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লেখক যে কাঠামোগত বিমূর্তায়নের আশ্রয় নিয়েছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া উপন্যাস দুটিতে সমতল ভূভাগ বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ আলাদা একউপকূলীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য লাভ করে পাঠক, যা আমাদের মূলধারা হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। তবে চিন্তায়, কর্মে, জীবনযাপনে, সভ্যতা ও আচারে ভিন্ন স্বভাবজাত এ অজ জনগোষ্ঠী আমাদের মূলধারারই গর্বিত অংশ। সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে এই উপন্যাসদ্বয়ে বিমূর্ত হয়ে ওঠা সমুদ্র-উপকূলের অরক্ষিত জনপদের রহস্যময় জীবনেরই সার্থক চিত্রের বিনির্মাণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. সৌরভ সিকদার (১৯৯৯), উপকূলীয় জীবনচিত্র এবং ব্যক্তির বাউলসত্তার কথামালা, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২১৮

২. আহমেদ মাওলা (১৯৯৯), কবির লেখা উপন্যাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৩৪

৩. আহমেদ মাওলা (১৯৯৯), কবির লেখা উপন্যাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২২৯

৪. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ১০২

৫. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ১০২

৬. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ১০৩

৭. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৩২

৮. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৩২

৯. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৩২

১০. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৯

১১. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৯৯

১২. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৯৯

১৩. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৬

১৪. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ৩৩

১৫. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭

১৬. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩

১৭. মাসুদুজ্জামান (১৯৯৯), *জন্মজাতি* প্রসঙ্গে, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২০৯

১৮. মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৯৪), *জন্মজাতি*, ঢাকা, বাংলাদেশ: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, উদ্ধৃতাংশের জন্য গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

১৯. মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৯৪), *জন্মজাতি*, ঢাকা, বাংলাদেশ: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ২

২০. মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৯৫), *মৈনপাহাড়*, ঢাকা, বাংলাদেশ: সাহিত্য প্রকাশ, উদ্ধৃতাংশের জন্য গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য।
২১. মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৯৫), *মৈনপাহাড়*, ঢাকা, বাংলাদেশ: সাহিত্য প্রকাশ, পরিচিতি পত্র
২২. মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৯৫), *মৈনপাহাড়*, ঢাকা, বাংলাদেশ: সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৩৬
২৩. মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৯৫), *মৈনপাহাড়*, ঢাকা, বাংলাদেশ: সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ২৬
২৪. মুহম্মদ মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৯৪), *জন্মজাতি*, ঢাকা, বাংলাদেশ: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ১৩৭
২৫. নিশাত খান (১৯৯৯), মৈনপাহাড়ের ধ্যানীসন্ন্যাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২১৬
২৬. নিশাত খান (১৯৯৯), মৈনপাহাড়ের ধ্যানীসন্ন্যাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২১৬
২৭. সিরাজ সালেকিন (১৯৯৯), কথার লতাপাতা ও চেতনার ফুল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ২৪২
২৮. সিরাজ সালেকিন (১৯৯৯), কথার লতাপাতা ও চেতনার ফুল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনু হোসেন ও কবির হুমায়ুন (সম্পা.), *সময় মানুষ: মুহম্মদ নুরুল হুদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ২৪২